Research Article

প্রতিধ্বনি the Echo

A journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

উপনিবেশোত্তর চেতনার আলোকে প্রান্তিকায়িত জনসমাজ : নির্বাচিত কয়েকটি উপন্যাসে এর প্রতিফলন

মৌসুমী নাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Post colonialism is often understood to be a period of time after colonialism and post-colonial literature is usually characterized by its opposition to the colonial discourse. However, any literature that expresses an opposition to colonialism, even if it is written during a colonial period, may be defined as postcolonial literature, primarily due to its oppositional nature. From this point of view, novels like 'Kankabati', 'Nildarpan', 'Bolmik', 'Tabubihanga', 'Aranyer Adhikar', 'Droupadi', 'Akasher Niche Manus', and Mohakaler Rather Ghora' have been discussed in this paper. The paper also highlights that the so-called renaissance and modernity in Bengali Literature took place under the imposed structure of an English modernity. Perceived in this light, a new dimension of Bengali novels could be found, where the plights of marginalized sections are being highlighted. The paper is analytical in nature construed with the help of Primary and Secondary data.

'থরে থরে ফলে সজিতে মারাত্মক রঙ। আমি নাড়াচাড়া করে দেখি আমার হাত বিষিয়ে উঠে। তাদের গায়ে যেন পারমানবিক ছোঁয়াচে। এই বিষ কি করে ছাড়ানো যায়? আমি বাগান থেকে ঘরে, ঘরে থেকে বাগানে নিঃশত্রু বীজের ডানামেলা দেখতে চাই'

(সিকদার অশ্রুকুমার, পৃ:১০৯৯)

পৃথিবীতে কোনো কিছুই সহজে নিজের আওতায় আনা যায় না। তা দৈনন্দিন জীবনের সুষম আহার গ্রহণের কথাই হোক কিংবা যে কোনো বিষয়ে নিজের অধিকারের কথাই হোক। এই সমস্ত কিছু পাওয়ার জন্য মনুষ্য সমাজ যুগে যুগে নিজের মত করে অক্লান্ত লড়াই করে এসেছে। ঠিক তেমনি যেমন করে অরুণ মিত্র বিষিয়ে ওঠা সজির মারাত্মক রঙের প্রতিবাদ করেছেন। আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় বিষয়টিও আসলে বিষিয়ে ওঠা সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা। ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়, "উপনিবেশোত্তর চেতনা হলো বিড়ম্বিত, নিরুপায় ও প্রান্তিকায়িত বাত্যজনের বেঁচে থাকার রণকৌশল, প্রতিরোধের ঘোষণা ও যুদ্ধক্ষেত্র।"[২] ঔপনিবেশোত্তর যুগে পিছিয়ে পড়া তৃতীয়

বিশ্বের দেশগুলোকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের দলকে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য করতে হয় অক্লান্ত প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদী মানসিকতা গড়ে উঠার ইতিহাসও কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত নয়। একদিনে এই ইতিহাস তৈরি হয়নি। এই ইতিহাস গড়ে উঠার পিছনে রয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণ ও পীড়ন। চুলোতে জমে থাকা ভস্ম থেকে আগুন জ্বলে ওঠাটা যেমন স্বাভাবিক তেমনি শোষণ ও পীড়ণের যন্ত্রণা থেকে প্রতিবাদী মানসিকতা গড়ে ওঠাটাও স্বাভাবিক। তবে আসল প্রশ্ন হল বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণ ও পীড়ণ সম্পর্কে আমরা কবে সচেতন হতে শিখি? কবে আমরা বুঝতে পারি বিভিন্ন ছল-কৌশলের মাধ্যমে তারা আমাদের দীর্ঘদিন ধরে শোষণ করে চলছে। মানব জীবনে এই সুদিন একদিনে আসেনি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আমাদের ঘুম ভাঙে এবং শোষিত করুণ অবস্থার জন্য প্রতিবাদী হয়ে উঠি; যার ফলস্বরূপ 'উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ' শব্দটি আমাদের মনে প্রাণে চেতনায় প্রবেশ করে।

ঔপনিবেশবাদ যখন নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষদের নিজস্ব চিন্তা চেতনাকে কেড়ে নিয়ে উপনিবেশবাদের স্বার্থে বাঁচাতে শেখায় তখন মনুষ্য সমাজের জীবন ধারা উপনিবেশবাদের শোষণে স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে এবং তা দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষরা নিজেদের 'মানুষ' বলে মনে করে না। বুর্জোয়া শ্রেণির দাসত্বকে অতি সহজেই তারা মেনে নেয়। বছরের পর বছর প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবেই চলতে থাকে। এমন কী দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া শিশুকে এভাবেই বড় করা হয়। সদ্য বেড়ে ওঠা বালক-বালিকারা দাসত্ব প্রথাকেই নিজেদের ভাগ্য বলে মনে নেয়। এই সমস্ত কারণেই আধিপত্যবাদীরা খুব সহজেই নিজেদের আধিপত্যের শেকড় ছড়িয়ে যেতে পারে। এই শেকড়ের শাখা প্রশাখা সাধারণ মানুষকে আঁকড়ে ধরলেও এর থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করার কথা তারা কখনও ভাবেনি। আধিপত্যরা এই সমস্ত উপনিবেশিকৃত মনের মানুষের কারণেই যুগের পর যুগ ধরে রাজত্ব করে চলছে। নিম্নবর্গীয় মানুষেরা এব্যাপারে এতটাই অচেতন যে নিজের শেকড়কে, নিজের ছায়াকে পর্যন্ত তারা নিজেই চিনতে পারে না।

ঔপনিবেশিক কালে সাধারণ ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শক্তি কী কী ভাবে শোষণ করেছিল তার একটি চিত্র এখানে তুলে ধরছি। ঔপনিবেশিক কালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকের 'বিভাজন ও প্রশাসন' (Divide and rule) নীতি থেকে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দেশ ছেড়ে চলে গেলেও তাদের ছড়িয়ে যাওয়া বিষে আমরা আজও জর্জরিত। ১৮৫৭-এর জনবিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসককে আতঙ্কিত করে কারণ বিদ্রোহের পর ভারতীয়দের এক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। তখন ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতীয়দের প্রতি কোনো ধরনের সহানুভূতি বা ভ্রাতৃত্ববোধ না দেখিয়ে কেবল মাত্র শোষণ ও নির্যাতনের মাধ্যমে শাসন কার্য শুরু করল। তাদের অভিমত ছিল, যে নির্দয়তার মাধ্যমে দেশ দখল করা হয়েছে এবং সেই নির্দয়তার মধ্য দিয়েই ভারতীয়দের শাসন করা হবে। 'Divide and rule' নীতির মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়, যাতে প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠী ভারতীয় হওয়ার ঐক্যতা হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। সে সময়ের এওকটি উর্দু পত্রিকায় সৈয়দ আহমদ খাঁ লিখেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানদের ওই সময় একসাথে রাখা কখনই উচিত হয়নি। কারণ বিভাজন ও প্রশাসন নীতি এতে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতীয়দের শোষণ করার জন্য এই নিম্নমানের রাজনীতি তৈরি করে। তাদেরই একটি উক্তি, "শুধু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টি নয়, এক ভাষাগোষ্ঠীকে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উসকে দিতে হবে।"[৩]

অখণ্ড ভারতবর্ষকে খণ্ডিত টুকরো টুকরো করার আয়োজন ইতিমধ্যে তারা করে নিয়েছিল। ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "দেশবিভাগ কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি হল দীর্ঘ প্রয়াসের পরিণতি।" দীর্ঘরাজত্বের পর যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রতাপ ও পীড়নের কর্মকর্তারা আমাদের দেশ থেকে বিদায় নেন তখন আমরা স্বস্তির শ্বাস নেই। কিন্তু সেই শ্বাস নেওয়ার উচিত সময় কি ঠিক তখনই? পাঠক সমাজকে অবগত করানোর জন্য বলছি ঔপনিবেশিক শাসকেরা আমাদের দেশ থেকে চলে গেছেন তবে ঔপনিবেশিকৃত কর্মকর্তারা আমাদের নির্জ্ঞান মনে শোষণ ও নিপীড়ন সহ্যকরার যে বীজ ঢুকিয়ে গেছে তা সহজে বের হয় না। উপনিবেশিক শাসনের বৃক্ষকে শেকড় থেকে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত একটি সুস্থ সচেতন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। ১৯৪৭-এ তারা আনুষ্ঠানিকভাবে চলে গেলেও, পরিনতি স্বরূপ তারা আমাদের অনেক সমস্যা দিয়ে যায়, যেমন উদ্বাস্তু সমস্যা, নিম্নবর্গীয় সমস্যা, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ইত্যাদি। ঘুরে ফিরে প্রথমেই খণ্ডিত ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু সমস্যার মধ্যদিয়ে শোষিত হল সাধারণ মানুষ। কোনো একটি দিকে ঔপনিবেশিক শক্তির জয় হল আবার সাহিত্যে এই খণ্ডিত ভারতের প্রতিচ্ছবি উঠে আসল। সকল ইতিহাস বিদরা স্বাধীনতার সময় পর্বকে ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যায়িত করলেন। কিন্তু বাস্তবে সেই সময়টা কী সত্যিই 'স্বর্ণযুগ'? উদ্বাস্তু সমস্যার সম্মূখীন হয়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমন ঘটে। একদিকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অন্যদিকে খাদ্যাভাব। সবমিলিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিষাক্ত দংশনের কথাই স্মরণে আসে। যে দংশন থেকে ভারতীয়রা আজও মুক্তিলাভ করতে পারেনি। বর্তমান যুগের নিম্নপর্যায়ের রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাত-পাতের বিভেদ, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির বিভেদ ইত্যাদির মূল সূত্র পঞ্চাশের দশকেই লুকিয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা পূর্বে যদি ঔপনিবেশিক চিন্তা চেতনাকে শেকড় শুদ্ধো ওপড়ে ফেলা হত তবে ভারতীয়রা এই সমস্যার সম্মূখীন হয় না। ব্রিটিশ ঔপ্নিবেশিক নামক বৃক্ষটিকে উপড়ে ফেলার আগেই ঔপনিবেশিক শক্তি তার শেকড় এমন ভাবে ছড়িয়ে দেয় যে ভারতীয়রা তার বিস্তৃতি খুঁজে পায় না। স্বাধীন ভারতে প্রথমেই উদ্বাস্তু সমস্যা যখন দেখা দেয় তখন ভারতীয়দের সচেতন না হয়ে উপায় নেই। তখনই প্রয়োজন হয় বিনিমানের অর্থাৎ পুরনো সব কিছু ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলা। ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় 'বির্নিমান এক জরুরি এবং আবশ্যিক আয়র্ধ।' দীর্ঘকাল শোষণের পর প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষরা ধীরে ধীরে শোষণ শোষক শোষিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত অবহেলিত নির্যাতিত, প্রান্তিকায়িত ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে আরও একবার অবগত হয় এবং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ মানব মনে প্রদীপের আলোর মত উদ্ভাসিত হয়। এই চেতনাবাদে বিনির্মান অত্যন্ত জরুরী কারন সময় পরিবর্তণশীল এবং সময়ের মতই মানুষের চিন্তাধারাও প্রতিটি মুহুর্তে পালটে যাচ্ছে। উপনিবেশোত্তর চেতনার বাস্তবিক পটভূমির প্রভাব সাহিত্যে কতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল এবার তা আলোচনা করা থাক। 'উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ' শব্দটি আমাদের বাংলা সাহিত্যে পূর্বে ছিল না। শব্দটি আমরা শিখেছি প্রতীচ্যের সাহিত্য থেকে। এই উপনিবেশোত্তর চেতনায় নিহিত রয়েছে বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা ও অপরতার তত্ত্ব, গ্রামসির আধিপত্যবাদ বিষয়ক তত্ত্ব, দেরিদার বিনিমার্ণনবাদ, ফুকোর জ্ঞান ও প্রতাপ সম্পর্কিত মতবাদ, লিত্ততার আধুনিকোত্তরবাদী সমালোচনা ইত্যাদি সর্বোপরি নারীচেতনাবাদ, যা ঔপনিবেশোত্তর চেতনার গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে বর্তমান কালে অবস্থান করছে। তাই আমরা বলতে পারি 'উপনিবেশোত্তর' শব্দ জুড়ে রয়েছে তত্ত্বের প্রাচুর্যতা। গ্রায়ত্রী স্পিভকের মতে উপনিবেশোত্তর চেতনা হলো সেই জায়গা যেখানে 'When the

marginal can speak and be spoken, even spoken for' [৫]

এই চেতনার মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যজন এবং অন্তেবাসী নারীর কথা পাঠক সমাজ শুনতে পায়। প্রান্তিকায়িত মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতাপের পাহাড় ছেদ করে সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের কানে এসে পোঁছায়। তাই কবি শঙ্খঘোষ কখনও উচ্চারণ করেছেন---

নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি বাঁচার আনন্দে।
নোটন নোটন পায়রা গুলি খাঁচাতে বন্দী
দু-এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি।[৬] (যমুনাবাতী)

আবার কখনও অস্তিত্বের জন্য লড়াই করেছেন-

এ যদি হয় সত্তা তবে অস্তিত্বের মানে থাকা, কেবল থাকা, তুমি বিশ্বগোচর থেকো।[৭] (সত্তা)

প্রথম বিশ্বের দেশগুলি দীর্ঘদিন ধরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে শোষণ ও নিপীড়ন করে গেলেও একসময় গ্যাস জমতে থাকা বেলুনের মতই তারাও ক্ষোভে ফেটে পড়ে, তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত ভারতবর্ষেও একই ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন ধর্ম জাতি উপজাতির মিলনস্থল ভারতবর্ষের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী এর প্রভাব পড়ে বাঙালি সত্তার উপর। উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নবর্গীয় প্রান্তিকায়িত মানুষদের কণ্ঠস্বর যখন সাহিত্যে উঠে আসে তখন সমগ্র সমাজ আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হয়। তবে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা এত সহজে তাদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আদল সরিয়ে নিতে নারাজ। তাই প্রয়োজন মতে তারা নিজেদের রূপ পাল্টে নেয়। বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের দুটি বিশ্বযুদ্ধে আমরা এই পাল্টানো রূপ দেখতে পাই। পুঁজিবাদীরা যতবারই নিজেদেরই রূপ পাল্টিয়েছে ততবারই কিন্তু সামাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের মুখোশ খুলে ফেলেছে। এই ক্ষেত্রে প্রবলভাবে কার্যকরী হয়েছে গণমাধ্যমের ব্যবহার। বিভিন্ন গণ আন্দোলণ তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোল ও মুণ্ডা বিদ্রোহ, নীল আন্দোলন, ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রাম, নক্সালবাদী আন্দোলন, সত্তরের জল বিভাজন ইত্যাদি এই উপনিবেশোত্তর চেতনার পরিচয় বহন করে। সাহিত্যের দিক দিয়ে যদি বিচার করি তবে দেখব এর আলোড়ন প্রথম শুরু হয় প্রতীচ্যে। বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা এব্যাপারে আমাদের পথ প্রদর্শক। উপন্যাসের প্রতিবেদন বিশ্লেষণে এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের তত্ত্বকথাই যুগান্তর এনে দিতে সাহায্য করে। মিখায়েল বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা ও অপরতার তত্ত্ব উপন্যাস পাঠে এবং বিশ্লেষণে বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়ে উঠে। শুধু বাখতিনই নন উপন্যাসের পাঠকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ এবং পুনঃপাঠের মাধ্যমে আমরা যাদের তত্ত্বের সহায়তায় উপনিবেশোত্তর চেতনা সম্পর্কে অবগত হই তাঁরা হলেন রবার্ট হাউজ, আইজের স্ট্যনলি ফিশ, মিশেল রিফাটেরে, নর্মাণ হল্যাণ্ড প্রমুখ তাত্ত্বিক। লাঁকা কিংবা বার্ত ও একোর পাঠকৃতি বিশ্লেষণে অবচেতন ও মনোবিকলন সম্পর্কে নতুন আলোকপাত আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গী পাল্টে দেয়। দেরিদা, দ্যম্যান ও ব্লুমের বিনির্মানবাদ একই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সর্বোপরি ফুকোর জ্ঞান, প্রতাপ ও যৌনতা বিষয়ক তত্ত্ব সাহিত্যের প্রতিবেদনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। নারীচেতনাবাদীদের মধ্যে শোয়াল্টের ক্রিস্তেভা, সিক্সো, ইরিগেরে প্রমুখ তাত্ত্বিকদের তত্ত্বকথার ভিত্তিতে উপন্যাসের বিশ্লেষণে আমরা বুঝতে পারি মানবজীবনে চূড়ান্ত সীমা বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে আর কিছু নেই। উপনিবেশোত্তর চেতনার বিশ্লেষনে নারী চেতনাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাহিত্যে উপনিবেশোত্তর চেতনার বিশ্লেষনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল আধুনিকোত্তরবাদ। জাঁ ফ্রাসোঁয়া লিত্ততার, আইহার, হাসান, জিউয়ি ফকেমা, লিণ্ডা হাচিয়ন, ফ্রেডরিক জেমসন প্রমুখ আধুনিকত্তোরবাদীদের তত্ত্বকথা সাহিত্যের অন্তর্ভুবন পাল্টে দেয়। প্রতীচ্যের তত্ত্বকথার

প্রভাব বঙ্গ সাহিত্য এড়িয়ে যেতে পারেনি। খুব সহজে বঙ্গ সাহিত্য তীব্রগতিতে এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। ষাটের দশক থেকে এই পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। সাহিত্যে উঠে আসল ব্রাত্য-শোষিত-নিপীড়িত অপর সত্তার কথা। এই নিপীড়িতদের শোষণ করার সূত্রপাত কবে হয়েছিল তা খোঁজ করলে এর শেঁকড় খুঁজে পাওয়া বড়ই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ কিংবা আধুনিক যুগেও এই শোষণ কার্য প্রচলিত আছে। কোনো যুগে কোনো শক্তি এর সংহার করতে পারেনি। এমন কী যে নবজাগরণ নিয়ে উনিশ শতক তার মহত্ব ঘোষণা করেছে সেই নবজাগরণও নিম্নবর্গীয়দের মুক্তি দিতে পারেনি। তারা বাত্য ছিল আর এখনও আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বিভিন্ন উপায়ে শোষকরা তাদের কেবল শোষণ করে গেছে। কখনও বর্ণগত ভাবে, কখনও বর্গগত ভাবে আবার কখনও লিঙ্গগত ভাবে নির্যাতিত হওয়া নিম্নবর্গীয়দের দৈনন্দিন কাহিনি ছিল। ন্যায্য পাওনাটুকু পাওয়ার অধিকার তাদের ছিল না। সমাজে যেমন তাদের নীচু চোখে দেখা হত রোজগারের প্রতিষ্ঠানেও তাদের জায়গা ছিল নীছু স্তরে। স্বল্পমূল্যে হাড়ভাঙা খাঁটুনি খেঁটে তাদের জীবন বিপদাপন্ন হয়ে উঠত। নিম্নবর্গীয় হওয়ার অভিশাপ মৃত্যু পর্যন্ত তাদের পিছন ছাড়েনি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটিতে অভাগীর কাহিনির মাধ্যমে তৎকালীন নিম্নবর্গীয়দের পরিস্থিতিকে তুলে ধরার সামান্য চেষ্টা করেছেন। বাত্যজনের মুক্তিলাভ ঔপনিবেশিক শোষণের বিস্তৃতিতে সহজ ব্যাপার হয়ে থাকেনি। বঙ্গবাসীর ধারনা ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিদায়পর্ব শেষ হওয়ার পর হয়তো নিম্নবর্গীয়দের মুক্তি ঘটবে। যে কারণে জমিদারী প্রথা, রাজরাজাদের শাসন প্রণালী ইত্যাদি লুপ্ত করা হয়। কিন্তু আভ্যন্তরীন ব্যাপারটা একই থেকে গেল। আসলে শোষণকার্যের রীতিকে ভাঙ্গা-গড়ার মাধ্যমে আরও একটু আধুনিক করা হল। নিম্নপর্যায়ের রাজনীতি এবার বাত্যজনদের শোষণ করতে শুরু করল। দেশের ৭৫% জনসাধারণ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। সেই নির্ভরশীল কৃষকদের উপরই অত্যাচার ভীষণভাবে দেখা দিল। কৃষক সমাজকে ভাগ করা হল কয়েকটি শ্রেণীতে। যাতে আধিপত্যবাদীরা আরও কিছু লুণ্ঠন করতে পারে। উচু পর্যায়ে ছিলেন জমিদার-মহাজন ভূ-স্বামী ইত্যাদি। আর নিম্নে থাকলেন কৃষক-শ্রমিক ভাগচাষী এরা। সারা বছর হাড়-ভাঙ্গা খাঁটুনির পর যা উৎপাদন করল তারা তার অধিকাংশই কর হিসেবে জমিদারকে দিতে হত তাদের। কর আদায়ে অসমর্থ হলে নানা রকমের অত্যাচারের মাধ্যমে কৃষকদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হল। ঔপনিবেশিক শাসন এই দরিদ্র সাধারণ কৃষকদের মুখের ভাত কেড়ে নিল। যার ফলস্বরূপ কৃষক আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হল। ১৯১৪ সালে এই বীজ রোপন করা হলে ১৯৩৩-এ তা অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন আন্দোলন সেসময় বাংলাদেশের কৃষক গোষ্ঠীকে আলোড়িত করে। ড. প্রিয়কান্ত নাথ তাঁর 'কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস'-এ এই আন্দোলনগুলির উল্লেখ করেছিলেন---

"ক. ১৯৩৮ সালে ২৪ পরগণায় খাস জমির আন্দোলন।

খ. ১৯৩৯ সালে বর্ধমান জেলায় ক্যানাল কর প্রতিরোধ আন্দোলন।

গ. ১৯৩৯ সালে উত্তরবঙ্গে হাটতোলা আন্দোলন।

ঘ. ১৯৩৮-৪০ সালে ময়মনসিংহ জেলায় টংক (একরকম ফসল খাজনা) বিরোধী আন্দোলন।

ঙ. ১৯৩৭-৪০ সালে সিলেট জেলায় নানকার (একধরণের বেগার প্রথা) আন্দোলন।"[৮]

ড. প্রিয়কান্ত নাথের সূত্র অনুযায়ী উল্লেখিত আন্দোলনগুলি দ্রুতগতিতে বাংলাদেশের ২৪টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে তেভাগা আন্দোলনের বীজ এইগুলোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যখন বাংলাদেশ কৃষকদের আন্দোলনে মুখরিত তখন একটিই স্লোগান

ধ্বনিত হতে শোনা যায়। 'জান দিব তবু ধান দিব না।' এই স্লোগানের মধ্যেই উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কৃষকরা সারা বছর ধান উৎপাদন করে আবার সেগুলোকে রক্ষা করতে গিয়ে নানা আন্দোলনও করতে হয় তাদের। এর জন্য বহু মানুষকে প্রাণত্যাগ করতে হয়। সেইসময় নিম্নবর্গীয়দের 'প্রত্যাখান' শব্দটি উচ্চারণের মধ্য দিয়েই উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য উচ্চারিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যকে অস্বীকার করে তারা ধ্বনি তুলল, 'লাঙল যার-জমি তার।' কৃষক জনগোষ্ঠী মহাজন জোতদার প্রভৃতি শ্রেণীর বিরোদ্ধে স্লোগান তুললেও এর পরিণতি দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। বাহ্যিক ভাবে কৃষকদের প্রতি সুবিচার হলেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিকে এখনও তারা নিম্ন পর্যায়ের শোষিত প্রতিনিধি, কারণ স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথার লোপ হলেও উচুতলার রাজনৈতিক প্রতিনধিরা সে জায়গা দখল করে নিয়েছেন। ফলে যতই উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ কৃষক সমাজে প্রবেশ করুক না কেন কৃষকরা সুবিচার এখনও পায়নি। কৃষকরা স্বাধীনভারতে উৎকৃষ্ট ধান উৎপাদন করে এবং সারা ভারতবাসীর অন্ন জোগাড় করে। অথচ তারাই রেশন থেকে চওড়া দামে (তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী) নিকৃষ্ট চাউল কিনে নিচ্ছে। উপনিবেশোত্তর যুগে ঔপনিবেশিক চক্রান্তের শিকার হচ্ছে এই কৃষক সম্প্রদায়। পরাধীন ভারতে তাই কৃষকদের আন্দোলন সমাপ্ত হয়ে যায়নি। এবার দেখাদিল নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই। দেখা দিল অন্ধ্রের 'তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন' (১৯৪৬-৫১) 'কাকদ্বীপ আন্দোলন' (১৯৪৭-৫০), 'নক্সাল বাড়ী আন্দোলন' (১৯৬৭, ২৪মে) ইত্যাদি। তবে সব আন্দোলনগুলোতে নানা কারণে সবাই যোগদান করতে পারেনি। যে কারণে আন্দোলনগুলো শুরু হয় সে কারণগুলো রাজনৈতিক কারণও হতে পারে আবার সে কারণগুলো অর্থনৈতিক কারণও হতে পারে নতুবা সাম্প্রদায়িক কারণও হতে পারে। তবে যাই হোক না কেন তখন স্বাধীন ভারতে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ, জঙ্গিদের হামলা, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য, ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক উপকরণের ব্যবহার, দেশীয় উপকরণের ক্রমহ্রাসমান চাহিদা, শিক্ষাগত মান হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি সমস্যা। স্বাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক নীতি চোড়া অসুখের মতই ভারতবাসীকে শোষণ করতে শুরু করল। যার ফলে জীবন আরও বিষাক্ত হয়ে উঠল। ক্যান্সার যেমন মানুষকে ভিতর থেকে কুঁড়ে কুড়ে খায় তেমনি এই রাজনীতিও ভারতবাসীকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে শুরু করল। ড. প্রিয়কান্ত নাথের উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য "অত্যাচারের অক্টোপাসে জীবন ধারণ হয়ে উঠল দুর্বিষহ। গণশক্তিতে সে সময়কাল প্রতিদিনের নারকীয় অত্যাচারের নির্মম, কিন্তু সত্য প্রতিবেদনকে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের সংগ্রামলব্ধ যা কিছু সবই বানের তোড়ে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হল।"[৯]

ঔপনিবেশিক শোষণ যখন আরও জোরদার হয়ে উঠে তখনই তরাই এর কৃষক আন্দোলনের জন্ম হয়। দীর্ঘশোষণ নক্সালবাড়ী এলাকার কৃষকদের অতিষ্ঠ করে তোলে। স্বাধীন ভারতের নিম্নমানের রাজনীতির চক্রান্তে নির্যাতিত হতে হতে বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকরা মুক্তির পথ খুঁজতে শুরু করে। নক্সালবাড়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ দেখতে পেল বাত্য, অবহেলিত, শোষিত জনগোষ্ঠী। এই মুক্তি কেবল জমির অধিকার কিংবা ফসলের অধিকার নয়। এই মুক্তি ছিল সামাজিক অধিকার, সকল ভারতবাসীর সমানভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। ছাত্র সমাজ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় নক্সালবাড়ী আন্দোলনে যোগদান করল। ১৯৬৭র মার্চ মাস এই আন্দোলনের ভিত্তিতে ইতিহাসের পাতায় স্মরনীয় হয়ে রইল। সত্তর দশক তাই বাংলা সাহিত্যে একটি জলবিভাজন রেখা তৈরি করল। ঔপনিবেশিক শক্তি যতই তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস

ভারতবর্ষে ছাড়ুক না কেন বিভিন্ন আন্দোলন সেই শক্তির মূল শিকড়কে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা অবশ্যই করেছিল। নক্সালবাড়ি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস' এ বলা হয়েছে, "শোষিত মানুষের তিন মূল শত্রু সামন্তবাদ, মুৎসুদ্ধি পুঁজিবাদও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের শপথ নিয়েছিল নক্সালবাড়ির সংগ্রামী কৃষকগণ।"[১০]

চারু মজুমদারের নেতৃত্বে চ্যায়ারম্যানের চিন্তাধারায় এই আন্দোলন চলতে থাকে। দেখতে দেখতে আন্দোলনের উত্তেজনা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে আন্দোলনের জন্য জনগণদের সংগঠিত করা হয়। স্বাধীন ভারত তাদের জন্য আর স্বাধীন মনে হল না। আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ বলে ভারতবর্ষকে সম্বোধন করা হল। বর্তমান ভারতের মূল লড়াই এবার এসে দাঁড়াল সামন্ততন্ত্র ও কৃষকগোষ্ঠীর মধ্যে। আন্দোলনকে পরিণাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে গেরিলাযুদ্ধের পরিকল্পনা করা হল। এই গেরিলাযুদ্ধ আবশ্যকীয় কারণ ব্রাত্যশ্রেণীর দাবী ভদ্রভাবে অবহেলা করাই ছিল সরকারের স্বাভাবিক চরিত্র। ১৯৫০ সালের কৃষিসংস্কার কমিটি অনুযায়ী, "কৃষিসংস্কারের যে কোন পরিকল্পনায় খেতমজুরের সমস্যা বাদ দেওয়াই হয়েছে এতকাল, তার মানে দাঁড়ায়, দেশের কৃষি ব্যবস্থার এক রক্তাক্ত ক্ষতের আরামের কোন ব্যবস্থা না করা।"[১১] স্বাধীনতা পূর্ববর্তী লড়াই ছিল ব্রিটিশ শাসকের সাথে কিন্তু স্বাধীন ভারতে যখন আপনজনকেই অবহেলা করা শুরু হয় তখনই অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন পড়ে বিপ্লবের। ইতিমধ্যে এর জন্য অনেক আন্দোলন হলেও এর পরিণাম স্বরূপ নিম্নবর্গীয়দের কোন লাভ হয়নি। বাহ্যিকভাবে সরকার নানা আইন প্রণয়ন করলেও সেগুলোর সঠিক প্রয়োগ করার সুযোগ কৃষকদের দেওয়া হয়নি। যেমন জমিদারী প্রথার বিলোপ। এই প্রথার বিলোপ হলেও নিম্নস্তরের কৃষকদের জীবন ধারণ পদ্ধতির এমন কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকরা আগেও দাস ছিল এখনও তারা দাস। জমির মালিকানা জমিদারের হাতে না থাকলেও কিছু চতুর ধুরন্ধর মধ্যবিত্ত জমির মালিকদের নানা চক্রান্তের কারণে দরিদ্ররা চির বঞ্চিতই রয়ে গেল। তাছাড়া ঋণের বোঝা দরিদ্র কৃষকের ঘাড় ছাড়তে নারাজ। সরকার দরিদ্র কৃষকদের এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নানা ভাবে সাহায্য করতে চাইলেও সাহায্যের মাধ্যম ছিল উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শোষকরা। ফলে সব পরিকল্পনার পরিণতিতে লাভবান হলেন মধ্যম ব্যক্তি বা সরকারের দালালরা অর্থাৎ যেন তেন প্রকারে কৃষকরা বঞ্চিতই রইল। বঞ্চিত কৃষকরা যখন 'মাও'-এর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হল তখনই ডাক পড়ল নক্সালবাড়ী আন্দোলনের। সে আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল :--- (১) গ্রামের সমস্ত ব্যাপারে কৃষক কমিটিগুলোর কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, (২) জোতদার ও গ্রামীন প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে সশস্ত্র এবং সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং (৩) জোতদারের একচেটিয়া জমির মালিকানা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সেই জমিগুলি কৃষক কমিটি মারফত কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে হবে।"[১২] আন্দোলনকে পরিণতি দেওয়ার জন্য আশ্রয় নেওয়া হল গেরিলা যুদ্ধের আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক দেশে কৃষকরা সঠিক বিচারলাভের আশায় গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে সামন্তশ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে শুরু করল। তাদের বিশ্বাস সামন্তপ্রথাকে নির্মূল করার মধ্যেই রয়েছে তাদের আন্দোলনের সফলতা। কৃষকরা গেরিলা যুদ্ধকে কার্যকরী করার জন্য গ্রামে তাদের কমিটি তৈরি করে, অস্ত্র যোগাড় করে আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটায় এবং শেষে সামন্ত শ্রেণীর উপর তা কার্যকরী করে। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল --- "(১) জোতদার জমিদার শ্রেণী জনসাধারণকে শোষন করে যে বিশাল সম্পত্তি জমা করেছে, তা বাজেয়াপ্ত করা (২) জোতদারের জমির ফসল ধান বাজেয়াপ্ত করা (৩) প্রজাপীড়ক অত্যাচারী জমিদার

জোতদারকে খতম করা। শ্রেণীশত্রুর দালালদের শাস্তি দেওয়া (৪) শ্রেণীশত্রুর রক্ষাকারী ঘৃণ্যপুলিশদলকে খতম করা (৫) জনযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে গেরিলাবাহিনী ও গণমুক্তি ফৌজ তৈরি করা এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম সমিতি ও শাসনব্যবস্থার জন্যে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করা।"[১৩]

গেরিলা যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ কার্যকরী হতে দেখা যায়। নির্মল ঘোষের তথ্য অনুযায়ী শ্রীকাকুলামে ১২জন শ্রেণীশত্রুকে মারা হয় এবং ৩৩ জন পুলিশ কর্মচারীকে নিহত করা হয়। দরিদ্র ভূমিহীন শোষিত রুগ্ন কৃষকরাই এখানে বিপ্লবের নায়ক হলেন। দেখতে দেখতে আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ সামন্তশ্রেণীও তাদের প্রতিনিধি পুলিশ কর্মচারীদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে তখন এই শোষক শ্রেণীদের মনোবল ভেঙে চুড়মার হয়ে যায়। নক্সালবাড়ি আন্দোলনের তথ্যসূত্রের দিকে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে শ্রীকাকুলাম অঞ্চলে ১৯৬১র মার্চ মাসের মধ্যে ৫০০ থেকে ৭০০ বর্গ মাইলের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শক্তিশালী প্রাচীরটির গোড়াখানা ভেঙে চূড়মার হয়ে যায়। তবে এর বিরুদ্ধে পুলিশের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বেশী দেরী হল না। বিপ্লবের প্রধান নেতা সহ অন্যান্য আরও সংগ্রামীদের প্রাণত্যাগ করতে হল। যুব ছাত্ররা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সহজ সরল কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লবী হয়ে ওঠার জন্য অনুপ্রাণিত করাই ছিল এই যুব সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ। গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলন বাদ দিয়ে হিংসাত্মক পথই যে সামন্তশ্রেণীর জন্য উচিত পথ তা তাদের বোঝানো হল। শহর অঞ্চলে সেই সময়ই গান্ধীজি, বিদ্যাসাগর প্রমুখদের মূর্তিভাঙা শুরু হয়। তারা সে আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তা বুঝতে আর কারও বাকী রইল না। নক্সালবাদীরা যখন সামন্তশ্রেণী ও পুলিশ বাহিনীকে নিঃশেষ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল তখন স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চপদস্থ পুলিশ বাহিনী ও সামন্তশ্রেণীর মিলিত চেষ্টায় নক্সালবাদীদের হত্যা করার দায়িত্ব পড়ল পুলিশ বাহিনীর উপর। এবার নক্সালবাড়ী আন্দোলনের সমাপ্তির পালা শুরু হয়। পুলিশ বাহিনী তৎপর হয়ে উঠল, নক্সালবাদীদের লাশ যেখানে সেখানে দেখা যেতে লাগল। নক্সালবাদীরা এই বিপ্লবে যত সংখ্যক বুর্জোয়া ব্যক্তিকে হত্যা করল এর উত্তরে পুলিশ বাহিনীও সেই সংখ্যক নক্সালবাদীকে হত্যা করল। ফলে নক্সালবাড়ী সংগঠন দেখতে দেখতে দুর্বল হয়ে পড়ল। মৃত বিপ্লবীদের যে চার্ট তৈরি করা হচ্ছিল সেই চার্টে খুব দ্রুতগতিতে জায়গা কম হয়ে আসল। মৃত বিপ্লবীদের নাম আর চার্টে ঢুকলা না। এই কারণে ১৯৭১-এর শেষে শহরে এই আন্দোলন বন্ধ করা হল। এর কিছু দিন পরেই ১৯৭২এর ২৮ জুলাই লালবাজার পুলিশ লক্আপে চারুমজুমদারের মৃত্যুর সাথে সাথে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঘোষিত নক্সালবাড়ী আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে, যদিও এই আন্দোলন আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশের মূল ভিত্তিকে নাড়া দিয়েছিল তা অনস্বীকার্য।

শোষক শ্রেণী যুগে যুগে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্নভাবে নিম্নবর্গীয়দের শোষণ করেছে। এই শোষণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা কখনই সম্পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি নারীমুক্তির আন্দোলন ব্যাখ্যা করা হবে। চিরবঞ্চিত নারীসমাজ ঔপনিবেশিক যুগে নিম্নমানের রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন এ কথা বলার অপেক্ষা থাকে না। একেবারে প্রাচীনযুগ থেকেই আমাদের সমাজে লিঙ্গগত বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। তাই নারী শোষিত শ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পুরুষের দাপটে নারীর এই দুর্দশা নিয়ে নারী বা পুরুষ কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। স্ত্রী লিঙ্গের এই দুর্দশা কেবল মনুষ্য সমাজেই নয় স্বর্গলোকে, প্রাণীজগতে ইত্যাদি সর্বত্রই। নারী যে পুরুষের সমকক্ষ

কখনই হতে পারে না তা যুগে যুগে প্রমাণিত হয়ে আসছে। তবে 'যেখানে পীড়ন সেখানেই প্রতিবাদ।'[১৪] অর্থাৎ দীর্ঘ শোষণের পর স্ত্রী জাতি এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠে। ভারতবর্ষে তা প্রমাণিত হয় ১৮৯০ সালে কাদম্বরি গাঙুলী যখন কলকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে আপন বক্তব্য পেশ করেন। সচেতন নারী ও পুরুষের মধ্যে এই যে লিঙ্গগত দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছিল তার সমাপ্তি এখনও ঘটেনি। মনে করা হয় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকে নারী যখন পুরুষের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে সেদিনই এই দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটবে। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী সম্প্রদায় দৈহিক ও আত্মিক যোগদানের মাধ্যমে নিজস্ব যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। তবে এই যোগদানের পথ যে খুব সহজ ও সোজা ছিল, তা নয়। কণ্টকপূর্ণ পথেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিল তারা। পরাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক শক্তি ও তাদের চেলাদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিল ভারতীয় নারীরা। উনিশ শতকে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন, সতীদাহ প্রথার বিরোধ করার সাথে সাথেই সবাই মনে করল এবার স্ত্রী জাতির মুক্তির দিন সন্নিকটে, যা এখনও মনে হয় সন্নিকটে কিন্তু 'সেদিন' টি আর আসে না। পরাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের চেলাদের মনোরঞ্জনের জন্য ভারতীয় রমণীদের সদা ব্যবহার করা হয়েছে। দরিদ্র কৃষক কিংবা কর্মচারী কর, সুদ, কায়িক শ্রম ইত্যাদি কর্মে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেই পরিবারের স্ত্রী লিঙ্গকে সদা আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। বঙ্গসাহিত্যের বহু উপন্যাসে এর উদাহরণ প্রত্যক্ষগোচর হয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বাহ্যিক আড়ম্বরে আমরা যখন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করার সুযোগ পেলাম তখন মনে হল এবার মনে হয় মেয়েরা মুক্তি লাভ করল। বিধবা বিবাহ প্রচলন হল, মেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করল। তখন আমাদের সহজ সরল নিষ্পাপ মন বুঝতে পারেনি ঘর কিংবা বাহির কোনদিকে মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার ভাগ্য নিয়েই তারা জন্মেছে। স্বাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক চক্রান্তে যখন প্রথম দেখা দিল উদ্বাস্তু সমস্যা তখনও নারীরাই সর্বাধিক শোষিত হল। গৃহহীন নারী নিজের সম্মান বজায় রাখতে করল অক্লান্ত লড়াই। অন্যদিকে নিজের ও পরিবারের ক্ষুধানিবারণের জন্য অর্ন্তভুবনের নারী বেরিয়ে আসল বাইরে। নারী নামক লতাগাছ যখন পুরুষ নামক বৃক্ষকে আষ্টে পিষ্টে না ধরে প্রখর রৌদ্রতাপে স্বতন্ত্র ভাবে বাইরে এসে দাঁড়ায় তখন পুরুষের নারী সম্পর্কে কৌতূহল কমে গেলেও তাকে সমকক্ষ হিসেবে কখনই মেনে নেওয়া যায় না। নারীরা চিরকাল হয় দেবী না হয় পায়ের তলাতে থাকার যোগ্য। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার যোগ্যতা তাদের নেই। দৈহিক বা মানসিক বলে নারীদের হীনতা প্রমাণ করার কোন ত্রুটি পুরুষতন্ত্র বাকী রাখেননি। নারীরা 'অপরসত্ত্বা' হিসেবে পরিচিত। অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থাদিতে এমন কী স্বর্গলোক কেন্দ্রিক নানা কাহিণিতে তা প্রমাণিত হতে দেখা যাবে। দেবরাজ ইন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য উর্বশীরা সদাই সচেষ্ট রয়েছেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রকে কোনোদিন কোনো নারীর মনোরঞ্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হয়নি। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে সখা হিসেবে পাওয়ার জন্য প্রতিটি যুবতী উতলা ছিল। কৃষ্ণ কাউকে নিরাশ করেননি অথচ তার চরিত্রে কোন দোষ নেই। অপরদিকে রাধা স্বামী থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণের কাছে ছুটে যেতেন বলে তাকে অনেক কটু কথা শুনতে হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো কখনও স্পষ্ট ভাবে আবার কখনও ইঙ্গিতের আকারে ফুটে ওঠে। 'চর্যাপদ' নামক প্রাচীন সাহিত্যে আমরা দেখি সুন্দরী ডোমিনীদের দৈহিক স্পর্শ পাওয়ার জন্য উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতরা নিষিদ্ধ পল্লীতে পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। অথচ প্রকাশ্যে এই ডোমিনীদের সংস্পর্শে তাদের জাত যায়। মধ্যযুগীয় কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর 'ফুল্লরার বারমাস্যা' পর্বে দেখি

ফুল্লরার বারোমাসের জীবন কাহিনী। এই কাহিনী সে তার সংসার বাঁচানোর জন্য সতীনকে শুনায়। এখানে পাঠকের মনে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে, কেন নারীকেই সবসময় পরিবার, সংসার, সম্পর্ক ইত্যাদির কথা চিন্তা করতে হবে। পুরুষ কেন করবে না। আধুনিক সাহিত্যে নারীর সমস্যা নিয়ে কতদূর আলোচনা হয়েছে পাঠক সমাজকে আজ আর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুল কথা ইত্যাদি উপন্যাস এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বর্তমান যুগে নারী চেতনাবাদ বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আর এই দিকটি রচনার উদ্দেশ্যই হলো নারীকে নিজের প্রতি সচেতন করে তোলা। তবে লক্ষণীয় বিষয় নারী নিজের প্রতি যতটাই সচেতন হোক না কেন বিরোধীপক্ষ তাকে শোষণ করার রাস্তা ঠিক বের করে নিচ্ছে। নারীকে শারীরিক, মানসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে দুর্বল রাখার কোন পথ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ছাড়েনি। নারীর অর্ন্তভুবনকে অপমানিত করার সকল চেষ্টা আমরা ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি শহরে প্রতিটি গ্রামে করতে দেখি। ২০১২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এরকমই একটা চেষ্টা আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষে রাজধানী দিল্লীতে। ২৩ বছরের মেডিকেল পাঠরত একটি স্বাধীনচেতনা মেয়েকে গণধর্ষণের মাধ্যমে আমাদের সমাজ আবার প্রমাণিত করল যে স্বাধীন ভারতে বাস করেও আমরা স্বাধীন নই। পিতৃতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপ নিম্নবর্গীয়দের উপর ছিল এবং থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। উক্ত ঘটনাটির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হলো যার কারণে মেয়েটির দেহে সর্বাধিক অত্যাচারিত হয় তার বয়স ১৭ বছর। অর্থাৎ কিশোর বয়সের একটি ছেলে ২৩ বছরের একটি যুবতীকে ধর্ষণ করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শোষণ প্রক্রিয়াকে আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিল। উল্লেখিত নির্দয়তার বার্তা যখন সারা ভারতবর্ষে পরিবেশিত হল তখন তা নিয়ে আন্দোলন হলো যথেষ্টই তবে তা থেকে শোষণ মাত্রা কমল না এক শতাংশও। কারণ তথ্যগত দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই দিল্লীতেই ৪৫ টি ধর্ষণকাণ্ড ঘটে যায়। 'দিল্লী' স্বাধীনভারতের রাজধানী অথচ এখানেই দুর্বল শ্রেণীর প্রতিনিধিরা সুরক্ষিত নয়। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া মেঘালয় ঘটনাও ভারতবাসীকে চমকিত করে। পঞ্চাশ উর্ধ এক মহিলার ধর্ষণ কাণ্ড ভারতবাসীকে কী মনে করিয়ে দিতে পারে? এই ধর্ষণের মধ্য দিয়ে কোনো পুরুষের যৌন আকাঙ্খা ফুটে ওঠে না, এখানে ফুটে উঠে নারীকে হীনতা দেখানোর, একান্ত চেষ্টা। ঠিক উল্টোভাবে এখানে ৩-৪ বছরের শিশুকন্যারাও সুরক্ষিত নয়। একেবারে জন্ম থেকেই মেয়েরা যাতে মাথা উচু করে বাঁচতে না শেখে তার সবরকম ব্যবস্থা আমাদের আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ করে রেখেছে। এই ভাবে আমরা দেখতে পাই শোষক শ্রেণী আমাদের আষ্টেপিষ্টে ধরে সবদিক থেকে শোষণ করার ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই করে রেখেছে।

এবার সাহিত্যে আসা যাক। সাহিত্য ভুবনে ঔপনিবেশিক শাসনেও কোন কোন ঔপনিবেশিক তাঁর চেতনাবাদী মনের পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ে ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের আরও একটি ভয়ংকর রূপ দেখা যায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় উপন্যাস কেন্দ্রিক তবু 'নীলদর্পণ' নাটকটির নাম উল্লেখ না করলেও ঔপনিবেশিক শক্তির ভয়ংকর রূপটি আরও একটু ভালো করে দেখা যাবে না। নাটকটি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীলচাষের নামে ভারতীয়দের উপর কী অত্যাচারই না করেছে। বাংলাদেশের জমি নীলচাষের উপযোগী বলে ইংরেজরা বাংলাদেশে এসে তাদের কুঠি তৈরী করে এবং বাঙালী কৃষকদের দিয়ে নীলচাষ করাতে শুরু করে। নীলচাষ করতে করতে ব্রিটিশ শক্তি যখন

দেখল তারা অত্যন্ত লাভবান হয়ে উঠেছে তখন লোভী ইংরেজ বণিকরা তাদের নৈতিক বোধ হারিয়ে ফেলে। ধানচাষের জমিতে এবার নীলচাষ শুরু হয়। কৃষকরা নীলচাষে অসম্মতি জানালে তাদের উপর নানারকম দৈহিক অত্যাচার চালানো হয়, করের পরিমান বৃদ্ধি করা হয়, মিথ্যে মামলা করা হয় তারপর পরিবারের সদস্যদের উপর অত্যাচার করতেও নীলসাহেবদের কোনো দ্বিধাবোধ ছিল না। এই অত্যাচারের মাত্রা এক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। বহু পরিবার ধ্বংস হয়। দীর্ঘ অত্যাচারের পর বিষয়টি নিয়ে পত্র পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়।

উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উপন্যাস রচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে নারায়ণ সান্ন্যালের 'বল্মীক' (জুলাই, ১৯৫৮) ও শক্তিপদ রাজগুরুর 'তবুবিহঙ্গ' (আগষ্ট, ১৯৬০) উপন্যাস দুটি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করছি। পূর্ব বঙ্গের ছিন্নমূল শরণার্থীদের নিয়ে মূলত উপন্যাস দুটি রচিত হয়েছে। নারায়ণ সান্ন্যালের উপন্যাসটিতে আমরা দেখি সাধারণ মানুষ নিজ আশ্রয়স্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ক্ষণভঙ্গুর আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলে। দু-দিন এখানে দু-দিন ওখানে, দু-দিন পেট ভরে খাওয়া, দু-দিন অনাহারে থেকেও নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে আরম্ভ করে। গৃহবধু প্রাণ বাঁচানোর জন্য অন্ধকার অন্দরমহল ত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। যার ফলস্বরূপ ক্ষমতাবান মাংসলোলুপ লোভী পুরুষের দৃষ্টি পড়ে এই নারীদের উপর। নিজের পবিত্রতা বজায় রেখে রোজগার করে পরিবারের আহার জোগাড় করা তখন মেয়েদের পক্ষে রীতিমত একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাসে দেখি শরণার্থীর বিপরীতে স্বদেশী ঔপনিবেশিক শক্তি গড়ে তুলেছে বিভিন্ন চক্রান্ত। অর্থাৎ শোষণ করার আরও নতুন নতুন পথ দুর্বলকে আরও দুর্বল বানানো, অসহায়ের বিপরীতে কুৎসা রটনা, নারী নির্যাতন ইত্যাদির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসক আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ঔপনিবেশিক শক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে পীড়নের নতুন নতুন হাতিয়ার জোগাড় করে চলছে। অবহেলিত ব্রাত্যজনেরা ঔপনিবেশিক শোষণের আদল থেকে নিজেকে মুক্ত করিয়ে নেওয়ার কৃৎকৌশল যখন আঁটতে শুরু করে তখনই জন্ম নেয় মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' কিংবা 'স্তনদায়িনী' কিংবা 'দ্রৌপদী'। মহাশ্বেতা দেবী আসলে সেই সময়কালে গড়ে তুলতে চেয়েছেন উপনিবেশোত্তর চেতনার একটি উন্মুক্ত কারখানা। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি যদি খোলাখুলি ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তবে আমরা দেখব যে উপন্যাসের শুরুতেই নায়ক বীরসার মৃত্যু এবং এই মৃত্যু শুধু আত্মার মুক্তি নয়; এই মৃত্যু উপনিবেশোত্তর চেতনার চিহ্নায়ক। বীরসা মুণ্ডা জাতির পক্ষ থেকে বিদ্রোহ বা উলগুলানের ডাক দিয়েছিল বলে ঔপনিবেশিক শাসকের চক্রান্তে সে মারা যায়। আসল খবর মুণ্ডাজাতির কানে পৌছলে প্রতিবাদী মন আরও ক্ষোভে ফেটে পড়বে তাই ছড়িয়ে দেওয়া হলো কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে বীরসার মৃত্যু হয়। ঔপনিবেশিক শাসকরা এই প্রতিবাদ থামানোর শত চেষ্টা করলেও মুণ্ডাজাতিরা সেদিন ভীষণ সংগ্রামের আকার ধারণ করেছিল। এই সংগ্রামী মনোভাবেই আমরা উপনিবেশোত্তর চেতনার উত্তরন খুঁজে পাই। অন্যদিকে বীরসার মা বীরসার প্রতীক্ষায় নদীর তীরে নীরবে বসে থাকে। সে বীরসা না ফিরা পর্যন্ত ঘরে ঢুকবে না। তাতে যদি প্রতীক্ষা করতে করতে তার (জারতী করমার) মৃত্যু হয়ে যায়, তাতেও তার কোন আপত্তি নেই। জারতী করমার এই অপেক্ষারত অবস্থা নীরব প্রতিবাদের সংবাদ বয়ে আনে আমাদের মনে। বীরসার মা বলেন, বীরসা যদি না ফেরে তবে তিনি নদী গাছ পাহাড় মাটি জল ইত্যাদি দেখতে দেখতেই মৃত্যু বরণ করতে চান। কিন্তু তিনি ঘরে ঢুকবেন না। তবে এখানে তিনি আমাদের কী ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন? তবে কি তিনি বীরসার আত্মিক অস্তিত্বকে প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পেতে

চাইছেন? বীরসা উপনিবেশোত্তর চেতনার প্রতিনায়ক। তার দৈহিক মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মিক মৃত্যু নেই। কারণ মৃত্যুর পূর্বে সে তাঁর চিন্তা বিশ্বকে মুণ্ডাজাতির মধ্যে পরিবেশন করে দিয়েছেন। এক বীরসা মরলে সে জায়গায় শত বীরসা তৈরি হওয়ার ব্যবস্থা সে করে দিয়েছে। তাই সে বলেছে, দেবতার মৃত্যু নাই; উলগুলানের শেষ নাই। তাঁর বক্তব্যে এই বিদ্রোহ যতবার পরাজিত হব, ততবারই নতুন করে নতুনরূপে বিদ্রোহ আবার জন্ম নেবে কারণ পরাজয়ে সংগ্রাম শেষ হয় না। তখন সংগ্রামের আরও তীব্র আকার দেখা যায়। তাই বীরসার মৃত্যুতে সেদিন কালোকুচকুচে নেংটি পড়া অরণ্যবাসীরা থেমে থাকেনি। উপনিবেশোত্তর চেতনা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালে যে মানবমনের উপর কতখানি গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা জানতে হলে উপন্যাসটিকে আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা দরকার। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আক্রমণের পূর্বে ভারতের উপজাতি শ্রেণীর মানুষরা কোনদিন এত বড় সংগ্রামের কথা ভাবেনি। কখনও ভাবেনি যে জায়গায় তাদের নিজের পূর্বপুরুষরা এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে, সে জায়গা তারা নিজের জায়গা বলে দাবী করতে পারবে না। স্বদেশী ঔপনিবেশিক শ্রেণীর প্রতিনিধি মহাজন ও জমিদাররা বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের দেশের মানুষকেই নিশ্চিহ্ন করার আয়োজন করে। দীর্ঘ দিনের শোষণের ফলেই গড়ে ওঠে সিধু-কানু, বীরসা এদের মত বিদ্রোহ নায়ক এই ক্ষেত্রে ১৮২০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত অব্যাহত থাকা কোল বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮২০-২১ সালের হো-গোষ্ঠীর চাষী বিদ্রোহ ও উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্রেও আদিবাসীরা গৌরবজনক ভূমিকা নেয়। ১৮৮৯ আবার রাঁচীতে কোল বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একুশ বছরের বীরসা এই ধরণের মহাবিদ্রোহেরই একজন প্রতিনধি ছিলেন। সে বিদ্রোহ মনোভাব নিয়ে জন্মায়নি। কিন্তু আশে পাশে গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক শোষণ প্রক্রিয়াই তাকে বিদ্রোহ নেতা করে তুলেছে। সে প্রাথমিক পড়া শেষ করে যখন খৃষ্ট ধর্মের পাঠ নিতে শুরু করে তখনই তার আত্মিক চেতনার জাগরণ ঘটে। সে ডিকুদের অত্যাচার ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়। আবার নিজেদের কুসংস্কারছন্ন দুর্বলতা সম্পর্কেও অজ্ঞাত থাকে না। শিংবোঙ্গার প্রতিনিধি হয়ে নিজেদের দুর্বলতা দূরীকরন করে মহাসংগ্রামে সে ঝাপিয়ে পড়ে। সংগ্রামে তার দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও তাঁর আত্মিক মৃত্যু কোনদিনই সম্ভব নয়। সে কোনোদিন মরতে পারে না। তাই বীরসার মা চির প্রতীক্ষায়। সামান্য কলেরা তাকে মৃত্যুর নৌকায় ভাসিয়ে দিতে পারে না। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি কেবল বীরসার কাহিনি নয় কিংবা মুণ্ডাজাতির কাহিনি নয়। মহাশ্বেতা আসলে বীরসার মধ্য দিয়ে প্রতিটি অবহেলিত বাত্য মানুষদের কথাই বলেছেন।

'অরণ্যের অধিকার' –এর মত মহাশ্বেতা দেবীর প্রায় প্রতিটি উপন্যাস এই শোষিত-দরিদ্র-নিপীড়িত মানবগোষ্ঠী কেন্দ্রিক রচনা। তাঁর উপন্যাসের নায়ক জন্মলগ্ন থেকেই নির্যাতিত। কখনও সে শ্রেণীগত কারণে শোষিত আবার কখনও বর্ণগত কারণে আবার কখনও লিঙ্গগত কারণে নির্যাতিত হওয়াই তার নির্ধারিত ভাগ্য। শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে তারা সদাই সচেষ্ট। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যিক ভুবনের অধিকাংশ জুড়ে থাকা কৃষি আন্দোলনের নায়কদের কথার মধ্য দিয়ে আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশের ঘৃণ্যতম অত্যন্ত নিম্নমানের রাজনীতির কুচাক্রান্তগুলি স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে। স্বাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বার্থে কৃষিব্যবস্থাকে যখন টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় তখন এই আন্দোলনগুলোর চরম পর্যায়ে না যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। বাঁচার তাগিদে নিম্নবর্ণের হরিজন ক্ষেতমজুর ইত্যাদিরা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে কিংবা বলা যেতে পারে অন্যের সাহায্য ছাড়া তারা নিজেরাই বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করে এবং

আন্দোলন শুরু করে। এরকমই একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই 'অপারেশন? বসাই টুড়'-তে। উপন্যাসের নায়ক খেটে খাওয়া এক ক্ষেত মজুর। সে সহজ সরল কথা বোঝে। রাজনীতির চক্রান্ত সে কোনোদিন বুঝতে চায়নি। স্বাধীনতার পর টুকরো টুকরো কৃষিব্যবস্থার চেহারা ছিল এরকম - ভাগচাষী, বড় কিষাণ, মধ্যম চাষী, শউরাবাবু ইত্যাদি। সরকার এদের সকলকে এক চোখে দেখলেন। শুধু বিচ্ছন্ন ভাবে পড়ে থাকল ক্ষেতমজুর আর ছোট চাষী। অর্থাৎ সমস্ত আইন কানুনকে ফাঁকি দিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি কিন্তু তার শোষণ কার্য ঠিক জারি রাখল। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষক আন্দোলন হওয়ার ফলে কৃষিব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণীদের ন্যায্য পাওনা আদায় হলেও ক্ষেত মজুররা কিন্তু বঞ্চিত থাকলেন। ক্ষেত মজুরদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে কোনো সাহায্য করবে না কারণ মাঝারি কৃষকদের সাহায্য করাতেই তাদের স্বার্থ নিহিত রয়েছে। এরপর সে বসাইটুডু কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে নিজেই ক্ষেতমজুরদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করে। মহাজন জমিদার এদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে তার আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনে প্রথম বসাই মারা যায় তবে দ্বিতীয় বসাই প্রথম বসাইয়ের জায়গা নিতে দেরি হয়নি। মৃত্যু হল দ্বিতীয় বসাইয়ের। তৃতীয় বসাই এবার তার জায়গা নিল সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে। আসলে মহাশ্বেতার ভাষায় লড়াই করা প্রতিটি ক্ষেতমজুরই এক একটি বসাই। জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতাটা এরা দেখতে পেয়েছিল। উচ্চবাক্য কিংবা বইয়ের কথা থেকেও তাদের জীবনটা ছিল অনেক বেশী সত্য। তাঁর উল্লেখিত একটি উক্তি - ভূঞা জমিদার, সাউ মহাজন, বাবরি জোতদার। তিন যমের ভাওশে মারখাই নাই কবে, মনে করতে পারি না।"[১৫] ক্ষেতমজুরদের দাবি ছিল তাদের ন্যায্য মজুরি আদায়। সারাদিন খাটুনির পর যখন তারা তাদের পাওনা পায় না তখনই তাদের হৃদয়ে ক্ষোভ জমতে থাকে। অন্যদিকে সারা ভারতের অন্যান্য শ্রেণীর কৃষকরা আন্দোলনে সাফল্য লাভ করে অথচ তারা কৃষক শ্রেণীভুক্ত হয়েও বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। খেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি ঠিক ভাবে আদায় হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য সরকারী ইন্সপেক্টরে নিয়োগ করার আদেশ জারি হল। সেই নিয়োগে কিছু কিছু নিয়ম-নীতি ধার্য করা হল যেমন---

"(ক) ভূস্বামীদের পরিবারমুক্ত লোকেরা কখনো নিয়োজিত হবেন না;
(খ) যথাসম্ভব তারা হবেন অবদমিত শ্রেণীর থেকে আগত এবং
(গ) তারা এ কাজকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন।" (ঘোষ নির্মল পৃ:১৩১)

উল্লেখিত নিয়ম-নীতি কাগজে কলমে ক্ষেতমজুরদের পক্ষে থাকল। কিন্তু বাস্তবে তা প্রয়োগ করে ক্ষেত মজুরদের অবস্থার উন্নতির বিন্দুমাত্র চেষ্টা হল না। কারণ যাদের ইন্সপেক্টর পদে নিয়োজিত করা হল শেষ অবদি তারা সামন্ত তান্ত্রিক শ্রেণীরই প্রতিনিধি ছিলেন। সুতরাং এদের কাছ থেকে সঠিক বিচারের আশা করা আর মরিচীকার পিছনে ছুটে বেড়ানো একই কথা। ক্ষেতমজুরদের আরো একটি সমস্যার দিকে মহাশ্বেতা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটি হল, চাষের জমিতে জলের ব্যবস্থা। জমিদার বা ভূস্বামী বা মহাজন ইত্যাদিরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে ক্ষেতমজুরদের প্রচুর উৎপাদনে বাধা দিতেন এই জলের ব্যবস্থার মাধ্যমেই। এক্ষেত্রে বর্ষার জল ছাড়া বসাইটুড়র শ্রেণীর আর কোনো উপায় ছিল না। নির্যাতিত জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বসাইটুডুদের এই ভাবেই সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই সংগ্রামের কোনো অন্ত নেই। কেবল পরিস্থিতি অনুসারে তাকে কখনও কখনও তীব্রতর রূপ নিতে হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর চেষ্টায় এদের কথা এদের বেদনা সমগ্র পাঠক সমাজের সামনে স্পষ্টতর ভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

প্রফুল্ল রায়ের 'আকাশের নীচে মানুষ' (১৯৮১) উপন্যাসটি বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রচনা। এই সময় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি

আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছে। বিগত ৩০ বছর আগেই তারা দেশ ত্যাগ করেছে কিন্তু দেশ ত্যাগের পরও তাদের চিন্তা চেতনা যে আরও শক্তিশালী ভাবে আমাদের দেশে বিরাজ করছে তার কথা বলতে গিয়েই প্রফুল্ল রায়ের 'আকাশের নীচে মানুষ' ঔপন্যাসটির অবতারণা। উপন্যাসটির পটভূমি ছোটনাগপুরের অর্ন্তগত একটি ছোটোখাটো জায়গা। রঘুনাথ সিং সেই জায়গার জমিদার। তার সম্পত্তির কোনো অভাব নেই। অর্থাৎ চাষের জমি, খামার বাড়ি, প্রকাণ্ড কোঠা বাড়ি, ডজন খানেক ঘোড়া, তিনটে হাতি, ঝকঝকে ফিটন, মোটর গাড়ি এবং আছে মানবধন যাদের দিয়ে ইচ্ছেমত ভূমি চাষ করানো যায়। জমিদার রঘুনাথ সিং এর কাছে এত কিছুর মালিকানা থাকলেও তার খেটে খাওয়া মানবধনের মালিকানা ছিল কেবল হাত পাঁচেক জমি। এই নীচু অস্পৃশ্য জাতের ভূমিদাসদের ঘরগুলো ছিল ঘেঁষাঘেষি করা মাটির বেঁটে ঘর। পাঁচ হাত জমিতে ঘেষাঘেষি করে করে মাটির ঘর তুলে একই ঘরে তারা কয়েকজন করে বাস করত। তার উপর ঘরগুলো থেকে মাটি খসে পড়েছে। ঠিকমত দরজা-জানালা নেই। এই ভাবেই তারা বাস করত। এই ভাবে তাদের পূর্বপুরুষরাও বসবাস করেছিল। এতে কারও কোনো অভিযোগ নেই। কখন তাদের যৌবন আসে কবে তারা বৃদ্ধ হয় তা এই ভূমিদাসরা কিছুই বুঝতে পায় না। তাদের চোখে কেবল একটাই স্বপ্ন, কবে তারা ঋণমুক্ত হবে। পূর্বপুরুষেরা দেনা শোধ করে বাকী জীবনটা তারা স্বাধীনভাবে কাটাবে। আসলে তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে মহাজন ও জমিদার নামক ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের রক্তচুষে চুষে রক্তশূণ্যতায় পরিণত করছে। কর্মক্ষম জমিদাসরা সকাল হতেই রঘুনাথের জমিতে ছুটে যায়। সারাদিন খাঁটুনির পর জমিদারের নানা চাহিদা পূরণ করে। অন্যদিকে যারা কর্মক্ষম নন অর্থাৎ বয়স্ক-বৃদ্ধ তাদের প্রতিও জমিদারের কোনো দয়াদাক্ষিণ্য নেই। নিজের খাদ্যদ্রব্যের অন্বেষন তাদের নিজেদেরই করতে হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণী শোষণের জন্য 'ভোট' নামক আরেকটি সক্রিয় পথ বের করেন। নির্বাচনে মনোনীত হওয়ার জন্য রঘুনাথ সেই অস্পৃশ্য অচ্ছুত জাতিদের নানারকম প্রলোভন দেখায়। উপন্যাসের নায়ক ধর্মার চোখে তখন শুধু ঋণমুক্তির আকাঙ্খা। সে কুশীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাবে। তাই সারারাত লড়াই করে যখন সে বাড়ি ফেরে তখন সে জানতে পায় রঘুনাথের প্রতিবেশীর মনোরঞ্জনের জন্য কুশী ও দোসদটোলার আরও তিনটি মেয়েকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। ক্লান্ত ধর্মার এই ধাক্কা থেকে নিজেকে সামলাতে খুব কষ্ট হয়। তারপর যখন সে দেনা শোধ করতে যায় তখন তাকে আরও একটি প্রবঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়। সে জানতে পায় তার ঋণ দু'হাজার টাকার নয়, পাঁচ হাজার টাকার। সেই মুহূর্তে ধর্মার ভিতরটা ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়ে। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর রঘুনাথ যখন দোসদটোলায় আসে তখন ধর্মার উক্তিতে আমরা উপনিবেশোত্তর চেতনার স্ফুরন দেখতে পাই। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা প্রতাপের পীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্খা আমরা ধর্মার উক্তিতে খুঁজে, "ঝুট ঝুট ঝুট। তহামনিকো আদমী নেহী। তুই আমাদের লোক না, আমাদের লোক না"[১৭] নক্‌শালবাদী আন্দোলনের পূর্বে উপনিবেশিকৃত চিন্তা চেতনা ভারতীয় কৃষকদের ছিন্ন ভিন্ন করার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। জমিদারী প্রথা যদিও ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে তথাপি এই জমির মালিকানা এখনও কৃষকগোষ্ঠী পুরোপুরি ভাবে পায়নি। ঔপনিবেশিক কালে ব্রিটিশ শক্তি যে উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের মধ্যে ভেদ-বিভাজন তৈরি করে গেছেন, তা সম্ভবত ভারতীয়দের মধ্যে দাসত্ব মনোভাব গড়ে তোলার জন্য। কৃষক জনগোষ্ঠী 'জমিদার' শব্দটি ভুলে গেলেও এখনও বিভিন্ন ভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে তাদের ঋণগ্রস্ত থাকতে হয়। ধানের বীজ, জলসেচ, কীটনাশক ইত্যাদি তাদের চওড়া দামে কিনতে হয়। ফলে এখনও তারা ঋণমুক্ত নয়। অথচ এই ধান তারা সমগ্র ভারতের জন্য

উৎপাদন করে। নক্‌শালবাদী আন্দোলন এর তীব্র বিরোধিতা করে। ১৯৪৬-৫১-এ রাজেশ্বর রাওয়ের 'তেলেঙ্গানা আন্দোলন' এ কৃষি বিদ্রোহের তুমুল রূপ দেখা যায়। নক্‌শালবাদী আন্দোলনের পর চীনের একটি পত্রিকায় তা নিয়ে লেখালেখি হয়। পত্রিকাটিতে লেখা হয় কংগ্রেস সরকার কৃষকদের জন্য বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোন পথ রাখেনি। ভারতবর্ষ আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন হলেও তা এখনও আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা ঔপনিবেশিক দেশ। এখনও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে শোষণ ও নির্যাতন চলে। ব্রিটিশ প্রভুরা না থাকলেও ভারতীয়রা এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই নিজের প্রভু বলে মনে করে। দূর দেশে বসেই তারা ভারতীয়দের কিনে নিয়েছে। এই সমস্ত কিছুর প্রভাব পড়ে ভারতীয় কৃষকদের উপর। কৃষকদের উপর চাপানো হয় সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি চাপ। কৃষকরা সারাদিন খেঁটে পেট ভরে খেতে পায় না। উৎকৃষ্ট খাবার উৎপন্ন করে তাদের নিকৃষ্ট খাবার খেতে হয়। কারণ আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি বিদেশী পুঁজিপতিদের ভোগের জন্য রপ্তানী করা হয়। এদিকে ভারতীয় কৃষকরা অনাহারে ক্ষুধায় পথে ঘাটে যেখানে সেখানে মরে পচে পড়ে থাকে। তাদের খোঁজ করার কোন ব্যক্তি নেই। তাই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নক্‌শালবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত, যা সমগ্র দেশ জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্যেও এর প্রতিফলন ঘটে। মহাশ্বেতা দেবীর 'চট্টী মুণ্ডা ও তার তীর', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া', স্বর্ণমিত্রের 'গ্রামে চল' ইত্যাদি এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। উপরের আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে সত্তর পরবর্তী বাংলা উপন্যাস অর্ন্তঃবস্তু ও প্রকরনের নিরিখি নতুন উজ্জীবিত সময়ের এক বিশ্বস্ত দলিল। এই আন্দোলন গুলো ভারতীয় রাজনীতির ফাঁক ফোকরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল। নিম্নবর্গীয় মানুষরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে আরও সচেতন হয়ে উঠল। এককথায় সত্তর পরবর্তী বাংলা কথা সাহিত্যে আমরা একটি নতুন অভিমুখকে দেখতে পাই।

<u>তথ্যসূত্র</u> :-

১. সিকদার অশ্রুকুমার, কবির কথা কবিতার কথা, প্রকাশিকা অরুনা বাগচী অরুনা প্রকাশনী ৭ যুগল কিশোর দাস লেন কলকাতা ৬, দ্বিতীয় সংস্করন আশ্বিন ১৪১০, ১০৯৯ পাতা।
২. ভট্টাচার্য তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদের পক্ষে সমীরন মজুমদার কর্তৃক টি/৪ বিধান নগর, মেদিনীপুর ৭২১১০১ থেকে প্রকাশিত, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করন : ফেব্রুয়ারী ২০০২, ১৫১ পাতা।
৩. রায় সোমনাথ, 'উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা, রত্নাবলী ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৯ প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৪/ফেব্রুয়ারী ২০০৮, ১১৭ পাতা।
৪. রায় সোমনাথ, 'উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা', রত্নাবলী ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৯ প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৪/ফেব্রুয়ারী ২০০৮, ১১৭ পাতা।
৫. ভট্টাচার্য তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদের পক্ষে সমীরন মজুমদার কর্তৃক টি/৪ বিধান নগর, মেদিনীপুর ৭২১১০১ থেকে প্রকাশিত, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করন : ফেব্রুয়ারী ২০০২, ১৩৮ পাতা।
৬. ঘোষ শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রকাশক : সুধাংশু শেখর দে। দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলতাকা ৭০০০৭৩ পরিবর্ধিত দে'জ দশম সংস্করন : ভাদ্র ১৪১১। সেপ্টেম্বর ২০০৪, ২০ পাতা।

৭. ঘোষ শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রকাশক : সুধাংশু শেখর দে। দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলতাকা ৭০০০৭৩ পরিবর্ধিত দে'জ দশম সংস্করন : ভাদ্র ১৪১১। সেপ্টেম্বর ২০০৪, ২৬ পাতা।
৮. নাথ প্রিয়কান্ত, কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস, প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ-স্বাধীনতা দিবস ২০০৭, ৫২ পাতা।
৯. নাথ প্রিয়কান্ত, কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস, প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ-স্বাধীনতা দিবস ২০০৭, ৬১ পাতা।
১০. নাথ প্রিয়কান্ত, কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস, প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ-স্বাধীনতা দিবস ২০০৭, ৫৮ পাতা।
১১. ঘোষ নির্মল, নক্শালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, প্রকাশক বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী ১৮ এ. টেমার লেন কলকাতা-৯, ৪০ পাতা।
১২. ঘোষ নির্মল, নক্শালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, প্রকাশক বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী ১৮ এ. টেমার লেন কলকাতা-৯, ৪৪ পাতা।
১৩. ঘোষ নির্মল, নক্শালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, প্রকাশক বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী ১৮ এ. টেমার লেন কলকাতা-৯, ৪৯ পাতা।
১৪. ভট্টাচার্য তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদের পক্ষে সমীরন মজুমদার কর্তৃক টি/৪ বিধান নগর, মেদিনীপুর ৭২১১০১ থেকে প্রকাশিত, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করন : ফেব্রুয়ারী ২০০২, ১৩৮ পাতা।
১৫. ঘোষ নির্মল, নক্শালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, প্রকাশক বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী ১৮ এ. টেমার লেন কলকাতা-৯, ১২৮ পাতা।
১৬. ঘোষ নির্মল, নক্শালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, প্রকাশক বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী ১৮ এ. টেমার লেন কলকাতা-৯, ১৩১ পাতা।
১৭. চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত, বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০২, মাঘ ১৪০৮।